যুগান্তর

তারিখ 31 JAN 2017
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

# প্রাথমিক শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ থেকে রক্ষা করুন

আহমেদ নূর

বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো কেজি স্কুল, ক্যাডেট স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসহ নানারকম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে। 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' না বলে এগুলোকে 'ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান' বলাই সঠিক। কারণ এগুলো সমাজে শিক্ষার প্রসারের জন্য গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠেছে লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে। এর প্রমাণ, যেসব এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেসব এলাকায়ও এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে! প্রায় প্রতিদিনই শহরের নতুন কোনো গলিতে অথবা গ্রামের কোনো পাড়ায় এরকম নতুন নতুন 'দোকানের' জন্ম হচ্ছে। জানি না কে বা কারা এসব খোলার অনুমতি দেয় অথবা এসব প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য আদৌ কারও অনুমতির প্রয়োজন হয় কিনা।

এসব প্রতিষ্ঠানের ভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য হল এখানে যে কেউ নিজ থেকেই শিক্ষক বনে যেতে পারে, শিক্ষক নিবন্ধন বা সরকারিভাবে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন তা ছাড়াই! শুধু তা-ই নয়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এসব কেজি স্কুলপ্রধানরা নিজেদের অধ্যক্ষ (Principal) বলেই সচরাচর পরিচয় দেন!

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ প্রার্থীরা সরকারিভাবে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষকতা করার অনুমতি পান, সেখানে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের একটু সুনজর পেলেই হয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা যা-ই থাকুক না কেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেখানে ১৮ মাসব্যাপী 'ডিপিএড প্রশিক্ষণ' ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন, সেখানে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণেরই প্রয়োজন হয় না! তবু এরা শিক্ষক! জানি না, এরকম প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের অনুমোদন পায় কী করে।

কিছু মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পড়ালেখা করানোটাকে আজকাল ফ্যাশন মনে করে। টাকা-পয়সা একটু বেশি থাকলেই হল। কাছের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যত যোগ্যই হোন না কেন, এরা টাকার গরমে সন্তানকে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দেন কেজি স্কুলে। এতে পাড়া-পড়শীরা ভাবে লোকটি সন্তানের পড়ালেখায় অনেক টাকা খরচ করছে। কেজি স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষের এ হুজুগেপনার কারণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে এখন অনেকে 'গরিবের বিদ্যালয়' বলেই মনে করে। তাছাড়া কেজি স্কুলগুলোতে প্রতি শ্রেণীতে আট থেকে দশটি করে বই থাকায় অভিভাবকরা মনে করে কেজি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করালে সন্তান অ… অনেক কিছু শিখে বিশাল কিছু হয়ে যাবে; কিন্তু এটা ভাবে না, যাদের কাছে তার সন্তানকে পড়তে দিয়েছে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, তাদের মধ্যে সততা কতটুকু রয়েছে, তাদের মধ্যে আদর্শ রয়েছে কিনা, সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানটি তারা কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ে শিশুরা কি কিছুই শিখতে পারছে না? এসব প্রতিষ্ঠানে পড়ে অনেক শিশু ভালো ফলাফলও তো করে? অনেকে বিষয়টা গভীরভাবে দেখেন না। গভীরে তাকালে দেখা যাবে, এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বিত্তশালী পরিবারের, যাদের বাবা-মাও শিক্ষিত হওয়ার কারণে বাবা-মায়ের কাছেও এরা বাসায় অনেক কিছু শিখে থাকে এবং এদের দু-তিনজন টিউটরের কাছে প্রাইভেট পড়ানো হয়, যার ফলে বিদ্যালয় থেকে তেমন কিছু শেখার প্রয়োজন হয় না। শেষে ফলাফল ভালো করলে অনেকেই মনে করেন এটা প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব। আসলে কিন্তু তা নয়। কেজি স্কুলগুলোতে যদি দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর পরিবারের সন্তানরাও পড়ালেখা করার সুযোগ পেত, তাহলে প্রকাশ পেত এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার প্রকৃত চেহারা।

কেজি স্কুলগুলো নিয়ে সরকারের নতুন করে ভেবে দেখার আরেকটি কারণ আছে। সরকার দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করেছে। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকার আইনেও পরিণত করেছে। দেশের সব শিশুর বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া একটা সাংবিধানিক অধিকার। এ আইন ও অধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কেজি স্কুল এবং প্রাথমিক স্তরের বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিক শিক্ষাকে চড়া মূল্যে বিক্রি করছে জাতির কাছে। অনেক প্রতিষ্ঠান আবার সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে পাঠ্যবই এনে সেগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ মোটা অংকের টাকায় বিক্রি করছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে এসব প্রতিষ্ঠান রীতিমতো ব্যবসায় …রছে। প্রাথমিক শিক্ষা তাহলে …ইল কই?

আশার কথা, এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অবশেষে সরকারের টনক নড়েছে। সরকার দেশের গ্রাম-গঞ্জ ও শহরের অলিগলিতে গড়ে ওঠা অবৈধ ইংলিশ মিডিয়াম, কিন্ডারগার্টেন ও বাংলা মাধ্যমের স্কুল বন্ধে ৫ মাস আগে উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৫৫৯টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ৫ মাস গত হওয়ার পরও মাঠ প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে কাজটি মোটেও এগোয়নি। এ সম্পর্কিত বড় একটি প্রতিবেদন গত ২৫ জানুয়ারি যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে এসব অবৈধ স্কুল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'কেজি স্কুলগুলো লাগামহীনভাবে চলছে। কোনো কোনো বেসরকারি প্রকাশকের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষক আছেন যাদের শিক্ষক হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। অনেক স্কুলের মালিক তার স্ত্রী ও সন্তানরা মিলে চালাচ্ছেন। আদায় করা হচ্ছে ইচ্ছেমতো ফি। যদিও শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও দেয়া হয় নামমাত্র। এককথায় রমরমা শিক্ষা বাণিজ্য চালাচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠান।'



অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ থেকে রক্ষার জন্য এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আশা করি সরকার এসব স্কুলকে শক্ত নিয়মের আওতায় আনার ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। বিশেষত যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেসব এলাকা থেকে প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নিতে এবং নতুন করে কোথাও কেজি স্কুল স্থাপনে অনুমোদন নেয়ার ব্যাপারে সরকার আইন প্রণয়ন করবে।

**আহমেদ নূর** : *শিক্ষক*
nurahmad786@gmail.com